PROJECT TIKTAALIK

বিজ্ঞান কমিক্স

জঙ্গলে গন্ডগোল

শুধুমাত্র বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

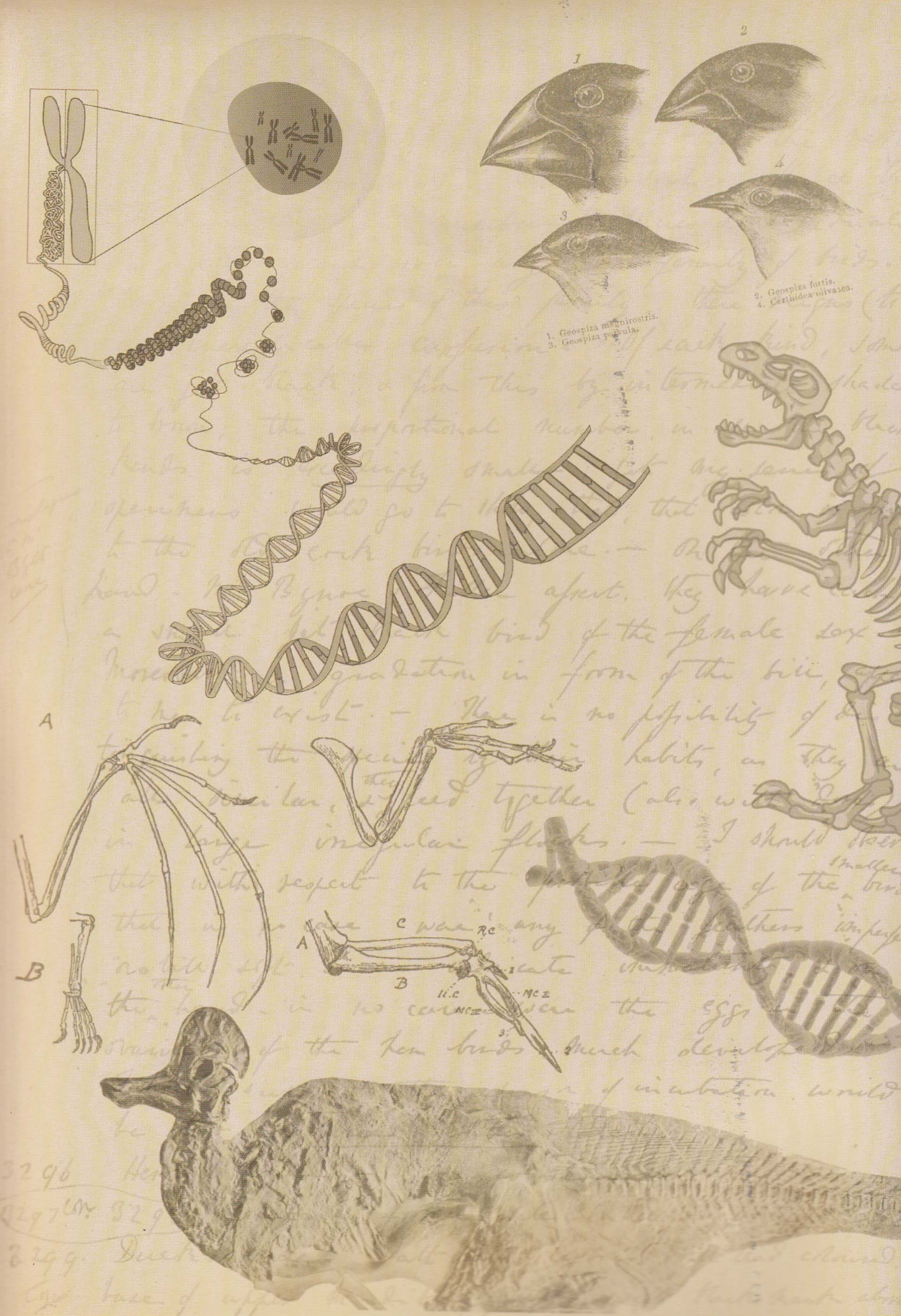
1. Geospiza magnirostris.
3. Geospiza parvula.
2. Geospiza fortis.
4. Certhidea olivasea.

জঙ্গলে গন্ডগোল

Project Tiktaalik: Learning Science through Comics
প্রকল্পের প্রকাশনায়–

বিজ্ঞান কমিক্স

জঙ্গলে গণ্ডগোল

গবেষণা, কাহিনী এবং ক্যারেক্টার ডিজাইন : নাসরীন সুলতানা মিতু

আঁকা : রোমেল বড়ুয়া

স্ক্রিপ্ট : সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ

প্রচ্ছদ : মেহেদী হক

সম্পাদনা : নাসরীন সুলতানা মিতু

প্রকাশকাল : এপ্রিল, ২০১৮

মুদ্রণ সহায়তা : ঢাকা কমিক্স
৪৭, দক্ষিণ বেগুনবাড়ি
তেজগাঁও, ঢাকা- ১২০৮

যোগাযোগ : projecttiktaalik@gmail.com

Disclaimer: This publication is funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, finding and conclusion stated herein are those of the authors and do not necessarily reflect those of the United States Department of State. The Federal awarding agency reserves a royalty-free, nonexclusive and irrevocable right to reproduce, publish, or otherwise use the work for Federal purposes, and to authorize others to do so.

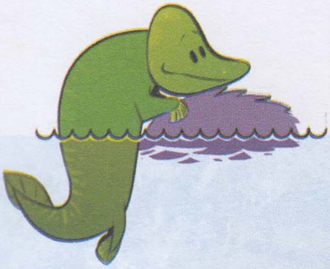

টিকটালিক বৃত্তান্ত

টিকটালিক কে? টিকটালিক হল গিয়ে এক ধরনের মাছ– নাহ্ মাছ নয় ঠিক। চারপেয়ে? নাহ তাও না! আসলে টিকটালিকের পরিচয় দেয়া আরেক মুশকিল। আমাদের পৃথিবীতেই চরে বেড়াত সে প্রায় সা–ড়ে সাঁই–ত্রি–শ কোটি বছর আগে!!! সে বহু কাল আগের কথা। আজকের পৃথিবীতে আর ওকে দেখতে পাবে না!

ওর পরিচয়টা দেয়া যাক এইবেলা। মাছই বলা যেত তাকে, পানিতে সাঁতার কেটে কেটে জীবন কাটিয়ে দিতেই পারত সে অন্য হাজার জাতের মাছের ভীড়ে। কিন্তু টিকটালিকের মনে যে হাজার প্রশ্ন– পানির ওপারে ডাঙায় কী আছে? সেই কৌতুহল মেটাতেই প্রথম ডাঙায় উঠে এল সে পানির ওপরের দুনিয়াটা কেমন তা দেখতে! আর মাছের পাখনা দিয়ে তো মাটির পৃথিবীতে হেঁটে বেড়ানো মহা বিপত্তি, কাজেই তার পাখনাগুলো ছিল ঠিক অন্য মাছেদের পাখনার মত নয়, বরং একটু একটু পায়ের মত– অনেকটা চারপেয়ে উভচর আমরা যাদের দেখি তাদের মত। সত্যি বলতে আজকের পৃথিবীতে সমস্ত উভচরের পূর্বপুরুষ হল আমাদের এই বন্ধু– টিকটালিক! তার আগে সকল প্রানি পানিতেই বেশ ছিল। টিকটালিকের দেখানো পথ ধরেই মাছ থেকে উভচর আর চারপেয়েদের, এমনকি আবির্ভাব ঘটে ধীরে ধীরে আমাদের!

টিকটালিকের দেখানো পথ ধরে কোটি কোটি বছর পার হয়ে গেছে, আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে শুধু মাটিতে কি আছে তা দেখেই কিন্তু আমাদের আর আঁশ মিটছে না! বরং আমাদের চারপাশের প্রকৃতির ঘটনাগুলো কেন ঘটে, কীভাবে ঘটে, আমাদের এই পৃথিবীর বাইরেও গ্রহ গ্রহান্তরে কী আছে তাও জানতে চাই আমরা!

এই শত শত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাদের অসীম কৌতূহল, তাদের জন্যই আমাদের এই প্রজেক্ট–

প্রজেক্ট টিকটালিক

রিঙ্কি

বন্ধুরা ডাকে সবজান্তা রিঙ্কি। এডভেঞ্চারে তুমুল আগ্রহ। বড় হয়ে বিজ্ঞানী হবে নাকি এস্ট্রোনট– সেটা ঠিক করতে পারেনি বলে জীবনের লক্ষ্য এখনো নিশ্চিত না!

অন্তু

পড়াশোনায় খুব একটা আগ্রহ না থাকলেও ফুল, পাখি, লতা, পাতায় তার খুবই আগ্রহ! পোষা টিয়া তিতু তার সবচেয়ে বড় বন্ধু!

নীলা

পেশায় ফসিলবিজ্ঞানী। ফসিল খুঁজতে একা একা সারা পৃথিবী চষে বেড়ান। অবশ্য এই মুহূর্তে বাংলাদেশেই আছেন।

দীপু

সারাদিন হলিউডি ফিল্ম দেখে নিজেকে সুপারহিরো ভাবা দীপুর প্রায়ই রাতে একা বাথরুমে যেতে ভয় লাগে। তবে এই গোপন তথ্যটা খুব বেশী মানুষ জানেনা!

বুঝলি অন্তু, রিংকিটা অত করে বলাতেই তোদের সাথে এই বনেবাদাড়ে ঘুরতে যাচ্ছি। নাহলে আমার কত কাজ এখন!
আর তোর টিয়াপাখিটা কাঁধে নিয়ে বসে আছিস কেন? খাঁচা-টাচায় রাখতে পারিস না?
আহারে, আমরা ঘুরতে যাচ্ছি– ওকে খাঁচায় বন্দী করবো কেন? ও পুরোটা সময় আমার কাঁধে কাঁধেই থাকবে।
এই দীপু, টিয়াপাখি টিয়াপাখি করছিস কেন? ওর একটা নাম আছে– তিতু। ক্যামেরা এনেছিস তো? জঙ্গলের পাখির অনেক ছবি তুলবো কিন্তু আজকে।

কয়েক ঘণ্টা পরে...
দীপু, এই যে গভীর জঙ্গলে এলি, ভূতের ভয়-টয় পাবি না তো আবার?
ভূত? হেহ...
না, তোর তো আবার ভয়-ডর একটু বেশি!
ভয়? আমার সাহস দেখলে তোরা চমকে যাবি।
মম চিত্তে নৃতে নৃত্যে... তা তা থৈ থৈ...
!
...আরেহ!

ওয়াও!!!
!!!
পেয়েছি!!!
আ... আআআ!!
হো হো হো হো... একটা ছবি তুলে রাখা লাগত রে অন্তু!! হা হা হো হো!!!!
কাঠবিড়ালির জন্য এতো ভালোবাসা তাহলে ইঁদুর দেখে মারতে যাস কেন? ওরা তো আত্মীয়!
বাজে কথা বলবি না একদম! ইঁদুর আর কাঠবিড়ালি এক হল??

কাঠবিড়ালি কত সুইট, কিউট!
সুইট তো অবশ্যই...
তাহলে বল ইঁদুরের মতো কুচ্ছিৎ প্রাণি আর কাঠবিড়ালি কিভাবে এক হয়?
আহা আমি কি এক বলেছি নাকি। বইয়ে পড়েছি এই দুই প্রানির পূর্বপুরুষ একই। সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম খালি।
বলে ফেললেই হল? যত্তসব গাঁজাখুরি!
মিউটেশন... মিউটেশন!
সবই মিউটেশনের ফল।
একি!!... কে আপনি?
!!
আমি নীলা। ভয় পেলে নাকি?

* প্রাগৈতিহাসিক যুগের উদ্ভিদ বা প্রানির শরীরের কোন অংশ যখন অনেক অনেক বছর পরেও কোনভাবে টিকে থাকে তাকে ফসিল বলে। প্রাচীনকালের জীবজন্তু সম্পর্কে জানার সবচেয়ে ভাল উৎস হচ্ছে মাটির নিচে সংরক্ষিত ফসিল রেকর্ড!

ক্রিটেশাস যুগ না কী যেন বললেন? এটা আবার কোন যুগ? কত বছর আগের?
সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের!
একদম ঠিক রিঙ্কি! ক্রিটেশাস যুগ শেষ হয়েছে আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে!!
ওইসময় কোন একটা বিশাল প্রাকৃতিক দুর্যোগে পৃথিবীর বেশিরভাগ বড় প্রানিরা মারা পড়ে! যেমন– ডায়নোসর!
ওই যুগের প্রানিদের সম্পর্কে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাটির নিচে থাকা ফসিল রেকর্ড!
ডায়নোসর!!
কিন্তু বাংলাদেশে সেযুগের ফসিল রেকর্ড তেমন একটা পাওয়া যায়নি।
সেই ফসিলের খোঁজেই এখানে আসা...
তা তো বুঝলাম... কিন্তু আপনি তখন মুইটেশন না কী জানি বললেন?...
মুইটেশন না... জেনেটিক মিউটেশন!
কিন্তু মিউটেশন মানে কী?

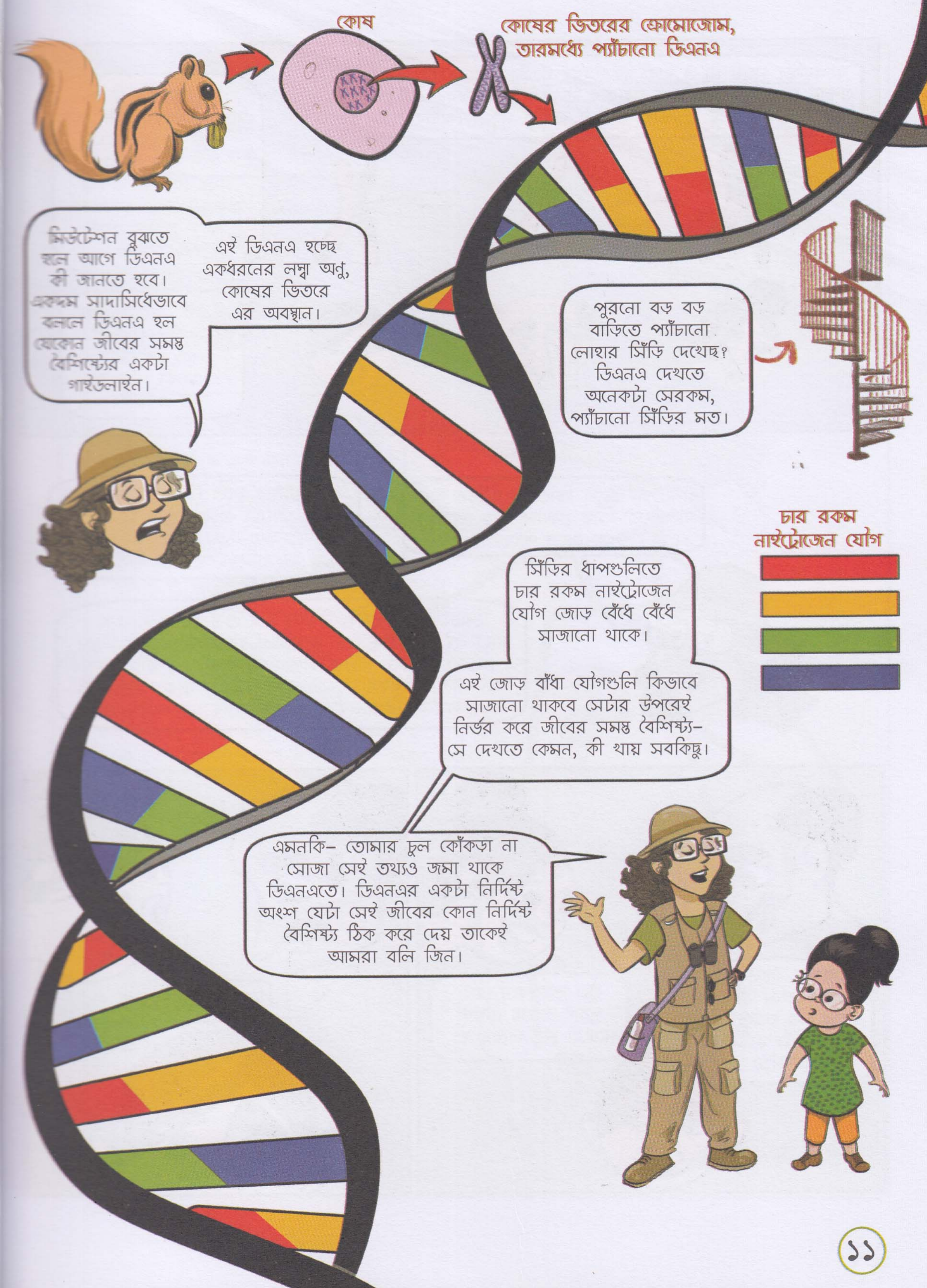
কোষ
কোষের ভিতরের ক্রোমোজোম, তারমধ্যে প্যাঁচানো ডিএনএ
মিউটেশন বুঝতে হলে আগে ডিএনএ কী জানতে হবে। একদম সাদাসিধেভাবে বললে ডিএনএ হল যেকোন জীবের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের একটা গাইডলাইন।
এই ডিএনএ হচ্ছে একধরনের লম্বা অনু, কোষের ভিতরে এর অবস্থান।
পুরনো বড় বড় বাড়িতে প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি দেখেছ? ডিএনএ দেখতে অনেকটা সেরকম, প্যাঁচানো সিঁড়ির মত।
চার রকম নাইট্রোজেন যোগ
সিঁড়ির ধাপগুলিতে চার রকম নাইট্রোজেন যোগ জোড় বেঁধে বেঁধে সাজানো থাকে।
এই জোড় বাঁধা যৌগগুলি কিভাবে সাজানো থাকবে সেটার উপরেই নির্ভর করে জীবের সমস্ত বৈশিষ্ট্য– সে দেখতে কেমন, কী খায় সবকিছু।
এমনকি– তোমার চুল কোঁকড়া না সোজা সেই তথ্যও জমা থাকে ডিএনএতে। ডিএনএর একটা নির্দিষ্ট অংশ যেটা সেই জীবের কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ঠিক করে দেয় তাকেই আমরা বলি জিন।

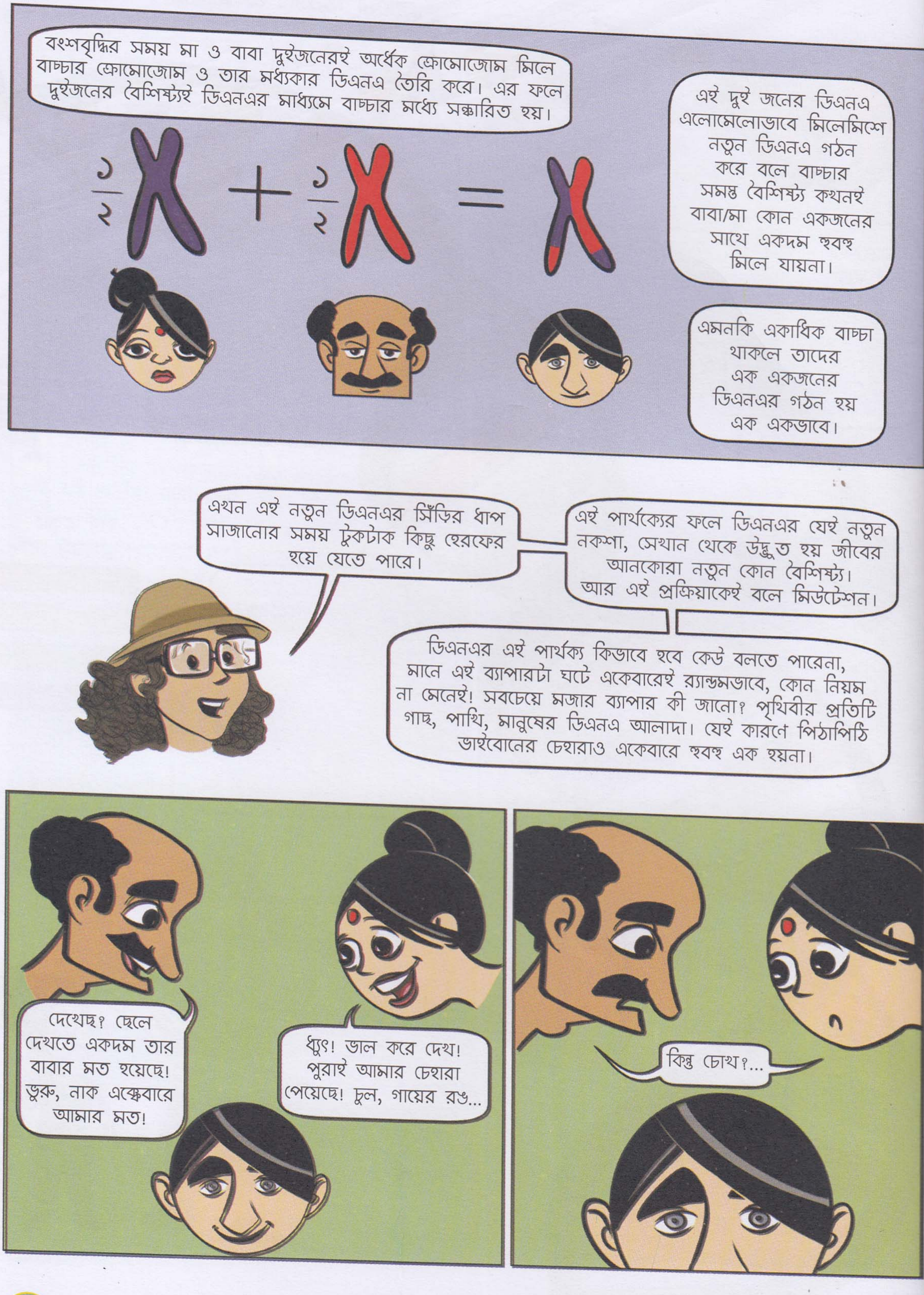
বংশবৃদ্ধির সময় মা ও বাবা দুইজনেরই অর্ধেক ক্রোমোজোম মিলে বাচ্চার ক্রোমোজোম ও তার মধ্যকার ডিএনএ তৈরি করে। এর ফলে দুইজনের বৈশিষ্ট্যই ডিএনএর মাধ্যমে বাচ্চার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।
১/২ + ১/২ =
এই দুই জনের ডিএনএ এলোমেলোভাবে মিলেমিশে নতুন ডিএনএ গঠন করে বলে বাচ্চার সমস্ত বৈশিষ্ট্য কখনই বাবা/মা কোন একজনের সাথে একদম হুবহু মিলে যায়না।
এমনকি একাধিক বাচ্চা থাকলে তাদের এক একজনের ডিএনএর গঠন হয় এক একভাবে।
এখন এই নতুন ডিএনএর সিঁড়ির ধাপ সাজানোর সময় টুকটাক কিছু হেরফের হয়ে যেতে পারে।
এই পার্থক্যের ফলে ডিএনএর যেই নতুন নকশা, সেখান থেকে উদ্ভুত হয় জীবের আনকোরা নতুন কোন বৈশিষ্ট্য। আর এই প্রক্রিয়াকেই বলে মিউটেশন।
ডিএনএর এই পার্থক্য কিভাবে হবে কেউ বলতে পারেনা, মানে এই ব্যাপারটা ঘটে একেবারেই র‍্যান্ডমভাবে, কোন নিয়ম না মেনেই! সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো? পৃথিবীর প্রতিটি গাছ, পাখি, মানুষের ডিএনএ আলাদা। যেই কারনে পিঠাপিঠি ভাইবোনের চেহারাও একেবারে হুবহু এক হয়না।
দেখেছ? ছেলে দেখতে একদম তার বাবার মত হয়েছে! ভুরু, নাক এক্কেবারে আমার মত!
ধ্যুৎ! ভাল করে দেখ! পুরাই আমার চেহারা পেয়েছে! চুল, গায়ের রঙ...
কিন্তু চোখ?...

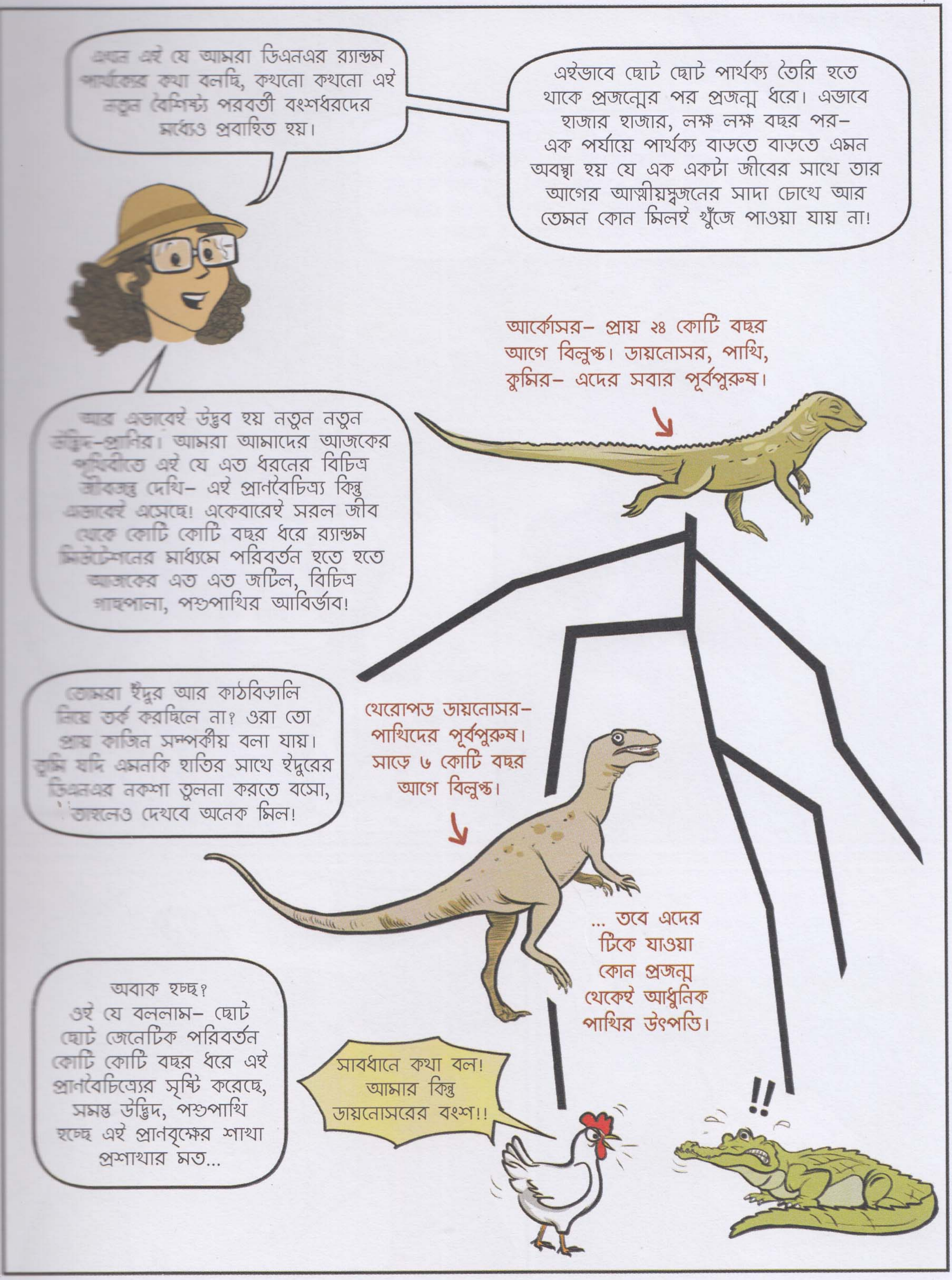
এখন এই যে আমরা ডিএনএর র‍্যান্ডম পার্থক্যের কথা বলছি, কখনো কখনো এই নতুন বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়।
এইভাবে ছোট ছোট পার্থক্য তৈরি হতে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। এভাবে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর পর– এক পর্যায়ে পার্থক্য বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হয় যে এক একটা জীবের সাথে তার আগের আত্মীয়স্বজনের সাদা চোখে আর তেমন কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না!
আর্কোসর– প্রায় ২৪ কোটি বছর আগে বিলুপ্ত। ডায়নোসর, পাখি, কুমির– এদের সবার পূর্বপুরুষ।
আর এভাবেই উদ্ভব হয় নতুন নতুন উদ্ভিদ-প্রাণির। আমরা আমাদের আজকের পৃথিবীতে এই যে এত ধরনের বিচিত্র জীবজন্তু দেখি– এই প্রাণবৈচিত্র্য কিন্তু এভাবেই এসেছে! একেবারেই সরল জীব থেকে কোটি কোটি বছর ধরে র‍্যান্ডম মিউটেশনের মাধ্যমে পরিবর্তন হতে হতে আজকের এত এত জটিল, বিচিত্র গাছপালা, পশুপাখির আবির্ভাব!
তোমরা ইঁদুর আর কাঠবিড়ালি নিয়ে তর্ক করছিলে না? ওরা তো প্রায় কাজিন সম্পর্কীয় বলা যায়। তুমি যদি এমনকি হাতির সাথে ইঁদুরের ডিএনএর নকশা তুলনা করতে বসো, তাহলেও দেখবে অনেক মিল!
থেরোপড ডায়নোসর– পাখিদের পূর্বপুরুষ। সাড়ে ৬ কোটি বছর আগে বিলুপ্ত।
... তবে এদের টিকে যাওয়া কোন প্রজন্ম থেকেই আধুনিক পাখির উৎপত্তি।
অবাক হচ্ছ? ওই যে বললাম– ছোট ছোট জেনেটিক পরিবর্তন কোটি কোটি বছর ধরে এই প্রাণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে, সমস্ত উদ্ভিদ, পশুপাখি হচ্ছে এই প্রানবৃক্ষের শাখা প্রশাখার মত...
সাবধানে কথা বল! আমার কিন্তু ডায়নোসরের বংশ!!
!!

শ্‌শ্‌...শ্‌! ওই দেখ কতগুলো ফুটি হরিণ! এই বাংলাদেশেই তুমি পাবে মায়া হরিণ, সাম্বা হরিণ... একই প্রাণি, কিন্তু বহু বছরের ডিএনএর র‍্যান্ডম মিউটেশনের ফলে চেহারায়, আকারে কত পার্থক্য! কি দারুণ না?
ফুটি বা চিত্রল হরিণ
সাম্বা হরিণ
মায়া হরিণ
বুঝলি তিতু? তুই আমিও এরকম র‍্যান্ডম মিউটেশনের ফল!!
?
আরেহ! তিতু!! তিতু কোথায়??

তাই তো! মাত্রই না দেখলাম পাখিটাকে?
তিতুউউউ! আমার তিতু!!...
আহাহা কাঁদিস না অন্তু... আশেপাশেই আছে নিশ্চয়ই! একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে...
কিন্তু এই জঙ্গলে তিতুকে খুঁজে বের করব কিভাবে?
দীপু, তুমি ঐদিকটায় দেখো, আর অন্তু ডানে যাও। আমি আর রিংকী এদিকটা খুঁজে দেখছি।
আ...আমি? একলা?
একটু পরে...
কোন কুক্ষণে যে রাজি হয়েছিলাম এই মরার জঙ্গলে আসতে...
সঁ...সশশশঁ...

!!!
কে যায়???
কে যায়???
বাঁচাও!!!!!
আআ-আআ-আ!!!!

সা–প!!
আ–আ–আ!!
আরে! এত ভয় পাওয়ার কী হল? এই সাপের তো আর বিষ নেই!
বিষ আছে নাকি নেই আমি জানব কোত্থেকে? আর এমন আজব রঙ, সাপ না গাছের ডাল বোঝার উপায় নেই, আরেকটু হলে অজ্ঞানই হয়ে যেতাম ভয়ে!
আরে গাছের সাপ যে সবুজ হয় আগে দেখিসনি? ওইজন্যই তো ডালের সাথে মিশে থাকে একদম!
নীলা আপা যে একটু আগেই বলল মিউটেশন র‍্যান্ডম হয় কোন নিয়ম না মেনেই... তাহলে গাছের ডালের সাথে রঙ মিলিয়ে একইরকম সাপের রঙ হল কিভাবে?

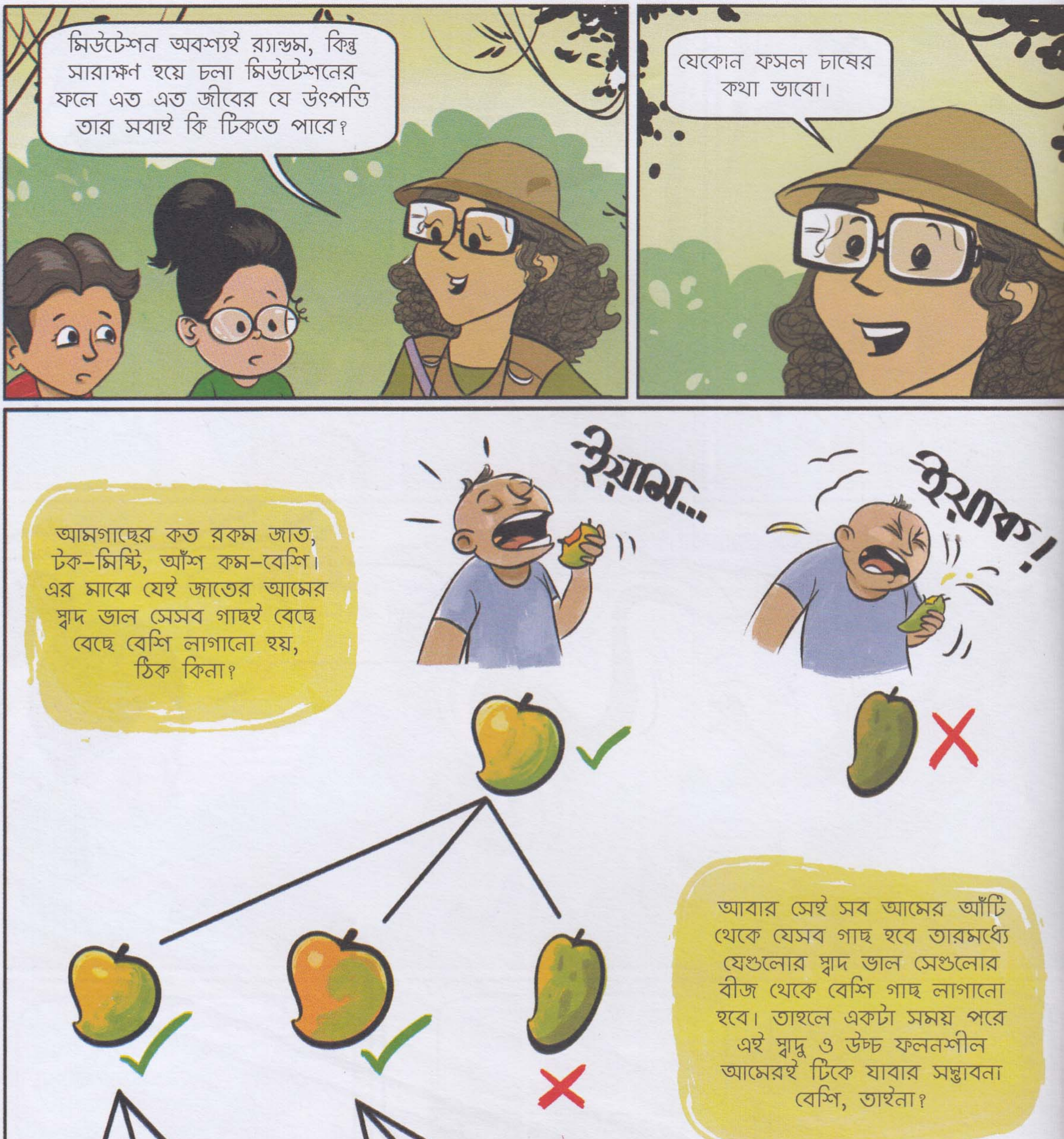
মিউটেশন অবশ্যই র‍্যান্ডম, কিন্তু সারাক্ষণ হয়ে চলা মিউটেশনের ফলে এত এত জীবের যে উৎপত্তি তার সবাই কি টিকতে পারে?
যেকোন ফসল চাষের কথা ভাবো।
আমগাছের কত রকম জাত, টক-মিষ্টি, আঁশ কম-বেশি। এর মাঝে যেই জাতের আমের স্বাদ ভাল সেসব গাছই বেছে বেছে বেশি লাগানো হয়, ঠিক কিনা?
ইয়াম...
ইয়াক!
আবার সেই সব আমের আঁটি থেকে যেসব গাছ হবে তারমধ্যে যেগুলোর স্বাদ ভাল সেগুলোর বীজ থেকে বেশি গাছ লাগানো হবে। তাহলে একটা সময় পরে এই স্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল আমেরই টিকে যাবার সম্ভাবনা বেশি, তাইনা?
তারমানে মিউটেশনে নানা জাতের উদ্ভব হলেও তাদের সবার টিকে থাকার সম্ভাবনা কিন্তু সমান না!

হ্যাঁ- কিন্তু সবুজ সাপ তো মানুষ এরকম বেছে বেছে গাছের আগায় রেখে দেয়নি!
তা রাখেনি। তবে কোন জীব কোথায় টিকে যাবে সেটার বাছাবাছির কাজটা করে প্রকৃতি নিজেই।

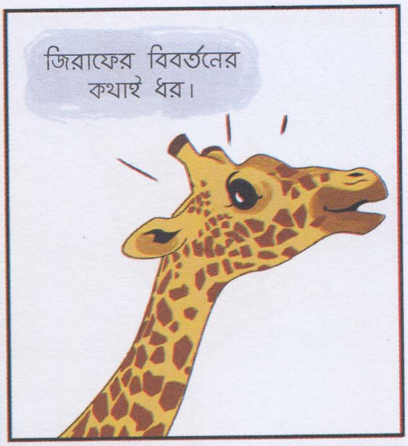
জিরাফের বিবর্তনের কথাই ধর।

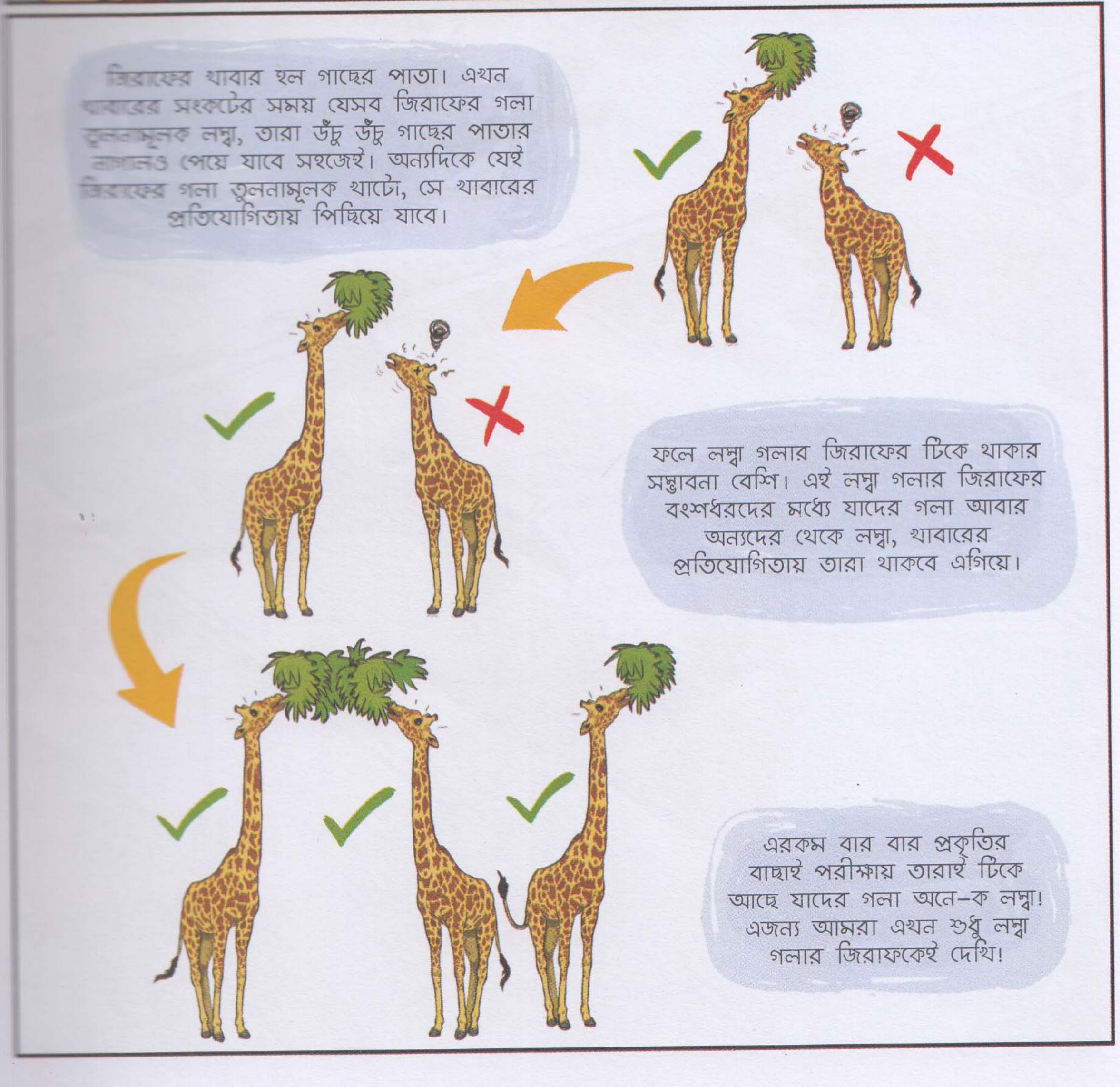
জিরাফের খাবার হল গাছের পাতা। এখন খাবারের সংকটের সময় যেসব জিরাফের গলা তুলনামূলক লম্বা, তারা উঁচু উঁচু গাছের পাতার নাগালও পেয়ে যাবে সহজেই। অন্যদিকে যেই জিরাফের গলা তুলনামূলক খাটো, সে খাবারের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাবে।
ফলে লম্বা গলার জিরাফের টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। এই লম্বা গলার জিরাফের বংশধরদের মধ্যে যাদের গলা আবার অন্যদের থেকে লম্বা, খাবারের প্রতিযোগিতায় তারা থাকবে এগিয়ে।
এরকম বার বার প্রকৃতির বাছাই পরীক্ষায় তারাই টিকে আছে যাদের গলা অনে-ক লম্বা! এজন্য আমরা এখন শুধু লম্বা গলার জিরাফকেই দেখি!

অনেক প্রানি দেখবে রঙ এমন যে দিব্যি পরিবেশের সাথে মিশে থাকে, যেমন– সবুজ ঘাসফড়িঙ, সবুজ সাপ। এসব প্রানি শিকারির চোখে ধুলো দিতে পারে সহজেই। কাজেই তাদের টিকে থাকার সম্ভাবনাও বাড়ে।
বাঁচলাম!
এই উদাহরণটা দেখ। ধর এখানে দুইরঙের পোকা আছে। এখন এই পোকাগুলি যেহেতু গাছের ডালে থাকে, বাদামি পোকাদের দূর থেকে খেয়াল করা যায় না, কিন্তু সবুজ পোকাদের ঠিকই চোখে পড়ে।
বাঁচাও!!
সর্বনাশ!!
এখন, পাখির খাদ্য হল এই পোকা। সবুজ পোকা যেহেতু চোখে পড়ে বেশি, কাজেই এই বেচারারা পাখির পেটে যাবে বেশি। ফলে সবুজ পোকার সংখ্যা যাবে কমে। তাই বংশবৃদ্ধিও হবে কম!
এখন কয়েক প্রজন্ম পরে এই সবুজ পোকা আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। পরিবেশের সাথে সবচেয়ে ভাল খাপ খাওয়ানো বাদামি পোকারাই টিকে যাবে।

গাছের গুঁড়ি
কুমির
আবার উল্টোদিক থেকে শিকারি প্রানিরও সুবিধা হয় পরিবেশের সাথে মিশে থাকলে। দূর থেকে যেহেতু খেয়াল করা যায়না, শিকার সতর্ক হবার সময়ই পায়না। একারনে খাবারের প্রতিযোগিতায় তারা এগিয়ে যায়।
খাবারের প্রতিযোগিতা একটা উদাহরণ। এরকম জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ইত্যাদি নানা কিছুর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে যেসব প্রাণি তারাই টিকে যায় ও বংশবৃদ্ধি করে।

একারনেই দেখবে যেকোন এলাকায় ওই পরিবেশের সাথে একদম মানানসই প্রানিরাই শেষমেশ টিকে থাকে। এই বাছাইপ্রক্রিয়াকে বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন।
এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণা প্রথম দেন বিজ্ঞানী চার্লস রবার্ট ডারউইন!
এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারনেই মেরু অঞ্চলের বরফের রাজ্যে দেখা মেলে একদম বরফের মত ধবধবে রঙের শ্বেত ভালুকের...
গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে মিশে থাকে অবিকল পাতার রঙের পোকা...
মরু অঞ্চলের ভয়ানক রুক্ষ আবহাওয়াতেও বহাল তবিয়তে টিকে থাকে উট, কুঁজের মধ্যে জমা চর্বি দিয়ে সে লম্বা সময় না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে!!

খালি চোখে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের গতি খুবই ধীর বলে আমরা হুট করে তা খেয়াল করতে পারি না। কিন্তু মিউটেশনের ফলে সব জীবেরই অবিরত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি হচ্ছে।
কিন্তু তার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য সময়ের সাথে টিকে যাবে তা ঠিক হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে..
আবার মানুষ যখন কোন পছন্দের জাতকে নিজের প্রয়োজনে টিকিয়ে রাখে তখন একে বলে কৃত্রিম নির্বাচন। গৃহপালিত গরু ছাগল, বা যেকোন ফসলের বিবর্তনের কথাই ধর... ও কী?...
খস...খস...শ..শ..
আআআ...বাঁচাও!!
একী!
কী হয়েছে দীপু?
ভূ.. ভূ... ভূত!
এই জঙ্গল খুব খারাপ...অভিশপ্ত...

কে যায়???
আর একমুহূর্ত না এই ভূতুড়ে জঙ্গলে। চল এখুনি যাই এখান থেকে...
কিন্তু... তিতু??
যাব তো বটেই। কিন্তু আগে তিতুকে খুঁজে বের করতে হবে। আর এই ভূতের রহস্যের সমাধান না করে এখান থেকে যাব না!

তি-তু!!!
তিতু!!!
তি-তু!!!
তি-ই-তু!!!

গর-র-র...
গর-র-র...
রি-রিঙ্কি!!! বা-বা-ঘ... আবা-র...
গর-র-র...
হাহাহাহা! একে নিয়ে এত কাণ্ড? এ তো মেছোবাঘ! ওদের যন্ত্রণা না করলে ওরাও মানুষকে সাধারণত ঘাঁটায় না। ভয়ের কিচ্ছু নেই!

মেছোবাঘ নামে বাঘ হলেও বিড়ালের খুব কাছের আত্মীয়। অবশ্য বাঘেরাও বিড়ালের আত্মীয়, তবে আরেকটু দুঃসম্পর্কের। মেছোবাঘ থাকে বনে জঙ্গলে, মাছ শিকার করে খায় বলে এর নাম মেছোবাঘ!

গর-র-র-র!
মিউটেশনের মাধ্যমে কিভাবে নানা প্রজাতির উদ্ভব হয় বলেছিলাম না? দ্যাখো, বিড়াল গোত্রের হয়েও আমাদের বাসাবাড়ির পোষা বিড়ালের সাথে এই মেছোবাঘের আকারে, চেহারায়,আচরণে কত পার্থক্য!!
মিঁয়াও!!

প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে কথা হচ্ছিল– মেছোবাঘ তার পরিবেশের সাথে কি দারুণ খাপ খাইয়ে নিয়েছে দেখ। আমাদের পোষা বিড়াল তো পানি দেখলেই পালায়, আর এই মেছোবাঘ দারুণ সাঁতারু, পানির নিচ থেকে ডুব দিয়েও মাছ শিকার করে!
বাবারে...!!!
ধুর! তোমরা আছ তোমাদের মেছোবাঘ নিয়ে। তিতুকে নিয়ে কারুর কোন চিন্তাই নেই...
আহ–হা! তিতুকে খুঁজছি তো আমরা সবাই। পেয়েও যাব, ভাবিস না!
তিতুউউউ!!
তিতুর যে রঙ, এই জঙ্গলে ও তো পুরাই মিশে থাকবে... খুঁজে পাওয়াই মুশকিল!

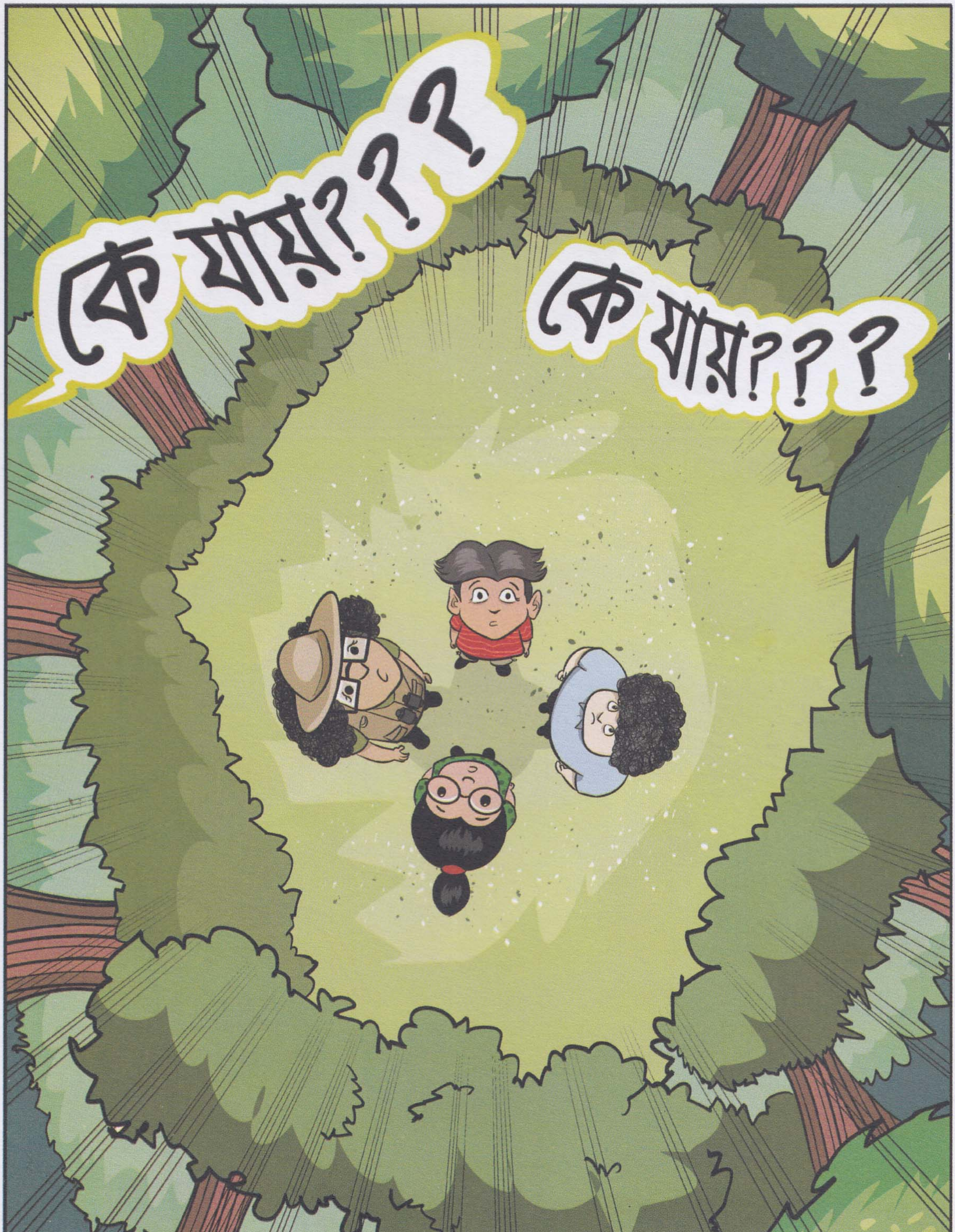
কে যায়???
কে যায়???

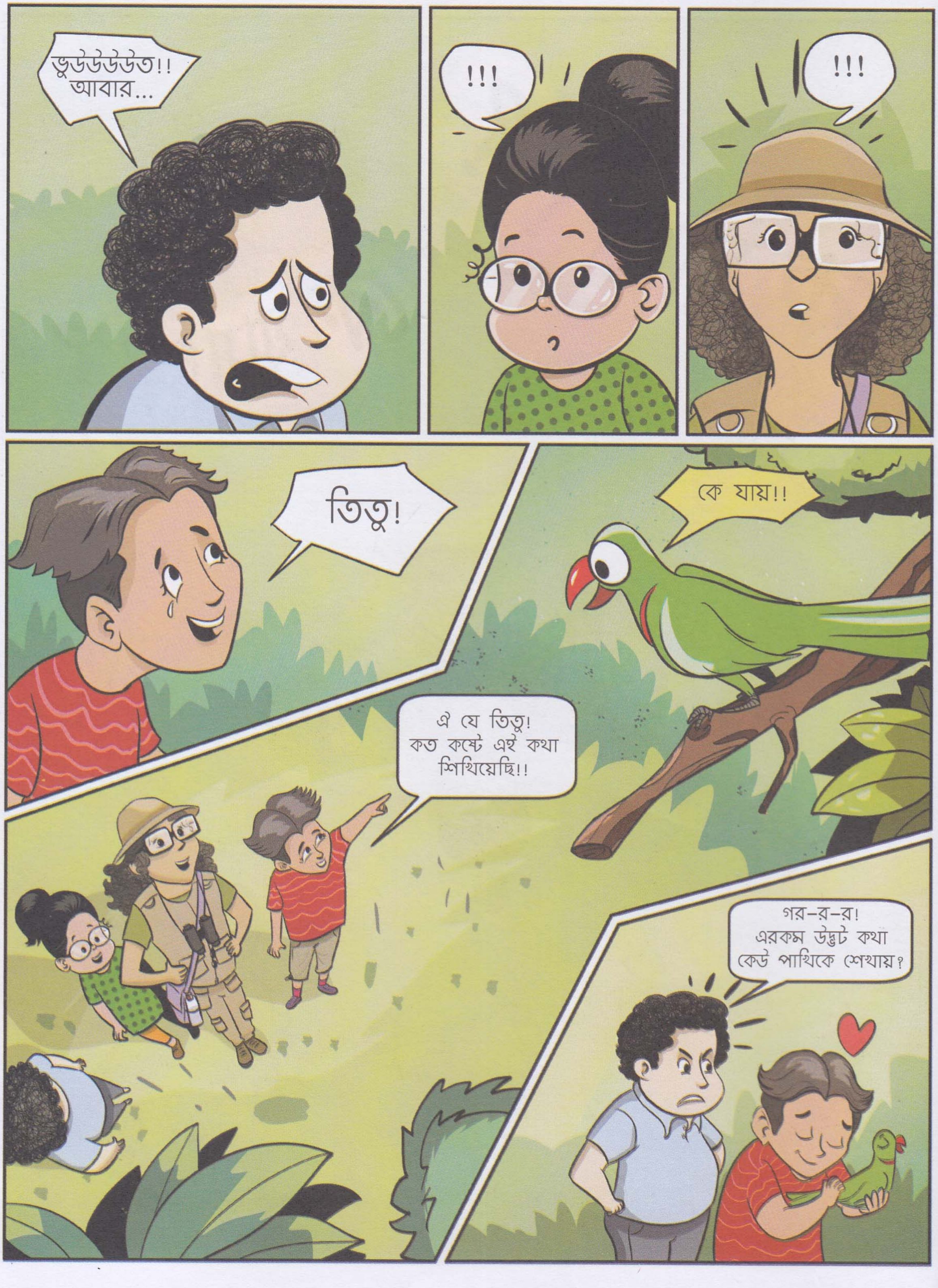
ভুউউউউত!!
আবার...
!!!
!!!
তিতু!
কে যায়!!
ঐ যে তিতু!
কত কষ্টে এই কথা
শিখিয়েছি!!
গর–র–র!
এরকম উদ্ভট কথা
কেউ পাখিকে শেখায়?

যাক! অনেক এডভেঞ্চার হল! ক্ষিদেও পেয়ে গেছে!
লাঞ্চের দায়িত্ব তো ছিল দীপুর– কী এনেছিস?
ডায়নোসরের ঠ্যাঙ!
মানে??
হাহাহা! ডায়নোসরের নাতি মুরগির ফ্রাই! নতুন প্রজন্মের ডায়নোসর আর কি!!!
হাহাহা!

শেষ

জানো কি?

অনেকেরই নিশ্চয়ই কুকুর পোষার শখ আছে! কুকুর নিয়ে একটা মজার তথ্য জানা যাক!

আজকের পৃথিবীতে এই যে আমরা হাজার জাতের কুকুর দেখি এদের সবার পূর্বপুরুষ কে অনুমান কর তো!

আচ্ছা বলেই দেই– পাড়ার নেড়ি কুকুর থেকে শুরু করে শিকারি কুকুর, আদুরে পুডল বা চিহুয়াহুয়া যত ধরনের কুকুর আছে– তার সবই এক জাতীয় ধূসর নেকড়ের বংশধর বলে ধারণা করেন গবেষকরা!!

অনুমান করা হয়, প্রাচীন মানুষেরা এখনকার ধূসর নেকড়ের কাছাকাছি কোন নেকড়ের জাতকে প্রথম বশ মানিয়েছিল। কুকুর তাদেরই বংশধর। আস্তে আস্তে একসময় মানুষের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয়ে ওঠে এই কুকুর। সময়ের সাথে উদ্ভূত নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মানুষ তার পছন্দসই ধরন বাছাই করেছে। আর এর ফলে ঘটে যাওয়া ধীরগতির বিবর্তনের ফলেই আজকের পৃথিবীতে আমরা এত বিচিত্র সব জাতের কুকুর দেখতে পাই!

1. Geospiza magnirostris.
3. Geospiza parvula.
2. Geospiza fortis.
4. Certhidea olivasea.
A
B
A
B
C

DEPARTMENT OF STATE
UNITED STATES OF AMERICA
GIF
GEIST
INTERNATIONAL
FOUNDATION
EXCELLENCE IN TRANSFORMING IDEAS

ই-বুক সংস্করণের জন্য